আমোদ

(গল্পগ্রন্থ – ছায়াছবি)

রামধন সকালে উঠে ঝিঙের ক্ষেত নিড়ুচ্ছিল। হঠাৎ তার কাছে তার ছেলে ফণি এসে বললে—বাবা, আজ বড় মজা হবে বাজারে ! শুনেচ কিছু ?

—কি রে ?

—ভালো যাত্রা আসবে কলকেতা থেকে। বড় দল। যাবা নাকি দেখতি ?

—যাব না ! বলিস কি রে ?তুই আমি দু-জনেই যাবানি। কলকেতার দলের গাওনা কতদিন শুনিনি বল তো ?

—পান্তাভাত খেয়ে নিয়ে চলো সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ি। নইলে জায়গা পাওয়া যাবে না। জানো তো কি রকম ভিড় হয় ?

মহা উৎসাহে রামধন ঝিঙের ক্ষেতের উত্তর আলের বেড়া বেঁধে বললে—আজ দশ বারো দিন হল বেড়াটা ভেঙেচে, বাবলাকাঁটা আর কুলকাঁটা দিয়ে বাঁধতে হবে। কিন্তু সম্প্রতি সে খুব অপমানিত হয়েচে হৃদয় বিশ্বাসের জমির বাবলাকাঁটা কাটতে গিয়ে।

হৃদয় বিশ্বেসের জামাই মাখন ওকে বলেছিল—বলি, এবার কিন্তু ফৌজদুরি হবে মনে রেখো। মোরা বাবলা গাছ রেখিচি তোমার বেড়ায় কাঁটা দেবার জন্যি নয়, মনে রাখবা।

সে বলেছিল—দুটো ডাল নেবানি তোমার গাছ থেকে, নইলে বেড়া দেবানি কি করে ?

মাখন রেগে বলেছিল—এ তো বড় আবদার দেখি,—তোমার ! ঘাড় ধরে বার করে দেব জমি থেকে বলে দিচ্চি। তোমার বাবার জমি তো নয় এটা ?

—বাবা তোলবার দরকার কি জামাইবাবু, না হয় চলে যাচ্চি !

—তাই যা—

ভালো বলতে হয় সীতেনাথ পোদের ভাই হরিকে। সে পাশের কলাবাগান থেকে নিম্নসুরে ওকে ডেকে বললে—বলি, বড়লোকের জমিতে কেন যাও দাদা ?আলের মাথায় আমাদের বড় বাবলা গাছটা থেকে যত ইচ্ছে ডাল কেটে নিয়ে যাও !

—দ্যাখো দিকি ভাই, কি অপমান সকালে করলে মোরে ?

—বাদ দ্যাও। সাত খাদা জমিতে ধান বুনে মাথা একেবারে স্বগ্‌গে উঠে গিয়েচে ওদের। বড়লোকের দোরে যাওয়ার দরকার কি তোমার দাদা, নিয়ে যাও ডাল যত ইচ্ছে।

সেই ডাল দিয়ে আজ দশ-পনেরো দিন পরে বেড়া বাঁধল রামধন। সেও জাতে পোদ, নিতান্ত গরিব। একটা ধানের ছোট্ট আউড়িও নেই বাড়িতে। এমন লোকের কি আর খাতির হয় গাঁয়ের বড়লোকদের মধ্যে ?

কাছারির নায়েব ঘনশ্যাম সরকারকে অনেক খোশামোদ করে বাঁধাল জমা দিয়ে গত আশ্বিন মাসে মাছ ধরে সামান্য কিছু পেয়েছিল। তাই দিয়ে ধান কিনে এতদিন চলেচে। এইবার ভরসা এই ঝিঙের ক্ষেত। ঝিঙের দাম আছে বাজারে এবার। যোলো টাকা মণ। ফি হাটে একমণ ঝিঙে বিক্রি হলেও ওদের সংসার হেসেখেলে চলবে। এ জমিতে ঝিঙে ফলবেও ভালো।

দুপুরের পর ভাতটাত খেয়ে রামধন আর তার ছেলে ফণি পাঁচঘরার বাজারে যাত্রা দেখতে যাবার জন্যে তৈরি হল। এখান থেকে ছ-কোশ পথ। পথে বামুনদহর বিল পার হতে হবে, কোদালে নদী পার হতে হবে, রাস্তা নেই, শুধু মাঠের আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে। মস্ত বড় শ্মশান পড়বে নকফুল-রামনগরের। কষাড় বন তিন পোয়া পথ।

ফণি বললে—বাবা, রাত্তিরি কি খাব ?

—চিঁড়ে সঙ্গে নিয়ো। তাই ভিজিয়ে বাপ-পোতে খেয়ে নেব।

—চল সকাল-সকাল বেরিয়ে যাই।

গেল ওরা বেরিয়ে দুপুরের পর।

রামধন পোদ একসময়ে যাত্রার বড় ভক্ত ছিল। একবার তার ছোটবেলায় মতি রায়ের বিখ্যাত যাত্রা-দল এসে 'তরণীসেন বধ'পালা গান করে সাহাপুরের বিশ্বাসদের বাড়ি। অমন গান কখনো এদেশে কেউ শোনেনি নাকি। রামধন সেই থেকে যাত্রা গাওনার কত বড় বড় দল যে দেখলে জীবনে।

মতি রায়ের দল গেল, তাঁর ছেলে ধর্মদাস রায়ের দল হল। ধর্মদাস নারদ সেজে কি সুন্দর অ্যাক্‌টো করতো, শুনলে চোখে জল আসতো।—গান কি একখানা !..

কতকগুলো গান তার চিরকাল মনে থাকবে।

সাঁতরা কোম্পানির দলের পাঁচুলাল বাগদীর কথা সে কখনো ভুলবে ?অমন জুড়ির গান, 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ' পালায় মুমূর্ষ অজামিলের সামনে দাঁড়িয়ে 'চেয়ে দেখো ঐ মহাপ্রস্থান' গানখানা !—সেই দুই হাত ওপরের দিকে তুলে একটা আঙুল দিয়ে বার বার অচেতন অজামিলের দিকে দেখিয়ে দেখিয়ে, বার বার মাথা দুলিয়ে—নাঃ, সে সব জুড়িও আজকাল আর যাত্রাদলে নেই, তেমন গানও কেউ আর গায় না।

যাদব বাঁড়ুজ্যের দলের রাজার অ্যাক্‌টো করত সেই একটি লোক—ঠিক একেবারে কি রাজামশাই ?আচ্ছা কোথায় ওসব লোক জোগাড় করে যাত্রা-দলের লোকেরা ?হাত-পা নেড়ে কি তার কথাবার্তা ! হাঁ করে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত রামধন পোদ...এই রকম না হলি রাজা ?রাজা এরেই বলে। কি তরোয়ালের ঝনঝনানি ! মাথায় মুকুটের একটা সাদা পালক উঁচু হয়ে থাকত, যেন ময়ূরের পেখম !

একবার একটা স্বদেশী গান হয়েছিল, ভূষণ দাসের 'মাতৃপূজা'। রামধন ভালো বুঝতে পারেনি, দেববালকগণ যখন সবাই হাত বাড়িয়ে অসুররাজের সেনাপতিকে বলতে লাগল— 'আমায় বাঁধ, আমায় বাঁধ'...বৃদ্ধ ব্রহ্মাকে যখন অপমান করলে অসুররাজের কর্মচারীরা—খুব ভালোই লেগেছিল। আসরের ভদ্দরলোকেরা ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছিল—রামধন পোদ তখন চুপ করে বসেছিল, জিনিসটা তার মাথায় ভালো ঢোকেনি যেন। বাইরে এসে সে একজনকে জিগ্যেস করেছিল—সুরেন্দর বলচে কাকে ওরা ?

—আহা, জানো না ! সুরেন বাঁড়ুজ্যে। মস্ত স্বদেশী। সাহেব মেরেছিল, ধরে নিয়ে গিয়েছিল বরিশালের সভায়।

—কেন গো বাবু ?

—স্বদেশী করবার জন্যে, আবার কেন ?

—ব্রহ্মা কে ?

—বরিশালের অশ্বিনী দত্ত।

—তিনি কে গো ?

—নাম শোনোনি ?মস্ত বড় স্বদেশী ! মহাপুরুষ লোক।

পুবদিকে ফরসা হয়েচে। কাক-কোকিলের ডাক শুরু হল ডালে ডালে। রামধন পোদ এইটুকু তথ্য সংগ্রহ করেই মহা হৃষ্টমনে গঞ্জের বাজার থেকে চলে এসেছিল। তখন দুবলহাটের গঞ্জে কলকাতার ফড়ে মহাজনেরা বেগুন মাপাত আড়াই টাকা মণ—কিন্তু জিনিসপত্তর সস্তা কত, একসের একটা কাতলা মাছ দু-আনা দিয়ে কিনে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এল দুবলহাটির বাজার থেকে।

কোথায় গেল সে সব দিন !

তারপর এল নতুন ধরনের যাত্রার যুগ।

জুড়ি উঠে গেল, গান হত নতুন ধরনের, সাবেক ধরনের পালাও আর নেই। পালার শেষে আজকাল রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন একদম উঠে গিয়েচে—রামধনের যেন কেমন কেন লাগে। ঠাকুর-দেবতার পালা আর হয় না—

এখন কি সব এসেচে—তার মানে ভালো বুঝতেই পারে না রামধন। সাজ-পোশাকেরও তেমন জাঁক-জমক নেই।

বেলা তিনটের সময় বামুনদ'র বড় বিলের পাড়ে এসে পৌঁছুল দু-জনে। ওপারে বড় একটা বটগাছ, কষাড় ঘাসের ঝোপ সবুজ হয়ে উঠেচে, টোপাপানা আর কলমীর দাম ডাঙার কাছে, বেশি জলের পদ্মফুলের খেলা, ঘন বর্ষা এ বছর, তারও পরে ধারা শ্রাবণ, দিনরাত বৃষ্টির কামাই নেই।

ফণি বললে—বাবা, একদিন ঘুনি পাতবা বামুনদ'তে, দ্যাখো মাছের বহর !

—কি মাছ রে ?

জলের ধারে এসে দ্যাখো। ঐ দ্যাখো পানার দামের তলায়।

রামধন সবুজ ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে দেখে বললে—মায়া আর ঘেঁয়া—

—দু-একটা বড় গজাড় দু-বার অ্যালানি দিয়েচে—

—কত বড় ?

—দু-সেরের ওপর হবে।

—তা এখন আর করি কি বল ! তেতপ্পর হয়ে গেল। যাত্রা শুনতে গেলি মাছ আর ধরা হয় না আজ।

—পার হবা কি করে ?বড্ড জল বেড়েচে বিলের !

—তালের ডোঙা-টোঙা দ্যাখ দিনি ! কোনোদিকে আছে কিনা ?

বিলের ধার দিয়ে দিয়ে প্রায় একপোয়া পথ গিয়ে তবে নাজির মালতের কলাবাগানের নিচে তাদের তালের ডোঙা পাওয়া গেল।

হাতে হুঁকো, সত্তর বছরের ওপর বয়েস। তাঁকে ডেকে বললে—ও মালতে ভাই, ডোঙাটা নেব ?

—কনে যাবা ?

—যাব যাত্রা শুনতি রামনগরের বাজারে।

—মাছ ধরবা না এ বছর বিলি ?বড় মাছ উঠচে !

—দ্যাখলাম। তা খাজনা বড্ড বেশি করেচে এ বছর জমিদার—চোদ্দ টাকা দিয়ে নাকি লাইকিনি করতে হবে। মোরা গরিব লোক, অত ট্যাকা কনে ?

—ধরো না মাছ, আমি আছি, কেউ কিছু বলবে না।

নাজির মালতে এ অঞ্চলের মধ্যে অবস্থাপন্ন ধনী গৃহস্থ।—চল্লিশ-পঞ্চাশটা ধানের গোলা বাড়িতে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চুল কেটে নিলে কি 'পরঘাট' করলে মালতে-বাড়ি জানান দিতে আসে দূর-দূরান্তর থেকে—তা থেকেও বেশ দু-পয়সা উপার্জন হয় ওদের। লোকও খুব ভালো। অনেক নিরন্ন দরিদ্র পরিবার গত পঞ্চাশের মন্বন্তরে ওদের গোলার ধান নিয়ে গিয়েচে।

মালতে বললে—তামাক খাবা না রামধন ?

—না মালতে ভাই, সময় হবে না। এখুনি পার না হলি জায়গা করতি পারব না।

ওরা শক্ত হাতে ডোঙা চালিয়ে বিলের মাঝখানের কষাড় দ্বীপে এবং তারপর সেখান থেকে সবুজ উলুঘাস ভরা ওপারে চলে গিয়ে একটা হিজল গাছের গায়ে ডোঙার দড়ি বেঁধে মাঠের পথ বেয়ে হেঁটে চলল আমিনপুরের দিকে। আমিনপুরের হরিহর সর্দার জাতে বুনো, রাস্তার ধারে বসে আউশের ক্ষেতে চৌকি দিচ্চে, ওদের দেখে বললে—যাত্রা শুনতি ?

রামধন বললে—তামাক আছে ?

—বোসা।খাওয়াই।

—যাত্রা শুনতি যাবা না ?

—কি করে যাই ?গরুর এখনো ম্যালা মাঠ। যদি ছেড়ে যাই, সব বেটাদের গরুতি শেষ করে দেবে। একে তো এবার ধানই হবে না দেশে, তার ওপরে ম্যালা মাঠ করে বসেচে এই ছেরাবন মাসেও। ভাবো দিকি।

তামাক খেয়ে আবার ওরা রওনা হল। ক্রোশখানেক গিয়ে ছোট্ট নদী কোদলা। ওপারে কাজি সাহেবদের বাড়ি। কাজি সাহেবদের নিজের খেয়া, বিনি পয়সায় পারাপার করে। রামধন ডাক দিতে ওদের লোক নৌকো নিয়ে এসে পার করে দিয়ে গেল।

বেলা একেবারে যায়।

পশ্চিমদিকে মস্ত কালো মেঘ উঠেচে।

ফণি দেখেই বললে—বাবা, হেঁড়ে চোমরা মেঘ ! বিষ্টি হবে।

—চল, নকফুলের জেলেপাড়ার সামনে। ওখানে বসব।

—শ্মশান পেরিয়ে গেলে হত না সন্ধেবেলা ?

—ভিজে যাবি যে !

—তা হোক বাবা। শ্মশানে বড্ড ভয় করে। এগিয়ে যতটা নেওয়া যায়। সর্দারদের ওখানে তামাক খেতি দেরি করে ফেললে যে !

ভীষণ মেঘ উঠেচে, ঝড়ে একপাল মিশকালো মেঘ ওদের দিকে উড়ে এসে সারা আকাশ অন্ধকার করে মাঠময় তার কালো ছায়া ফেললে। সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে। সজল বাতাস বইচে। উলুখড়ের মাথা দুলছে—রামধন বললে—দৌড়ো বাবা ফণি, দৌড়ো—

কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় বৃষ্টি না হয়ে মেঘ উড়ে শ্মশানের বড় বটগাছটার উঁচু মাথা পেরিয়ে উত্তর পুব কোণের দিকে উড়ে বেরিয়ে গেল। ফণি খুব জোরে জোরে হাঁটতে লাগল সন্দের অন্ধকারের আগে শ্মশান পেছন ফেলতেই হবে। ও বড় যে-সে শ্মশান নয় !

এ অঞ্চলের নামডাকী শ্মশান। কি নেই ওখানে ?

ভূত আছে, গোদান আছে, বেঁকি আছে, পেত্নী আছে—এত ভূত আছে দিনমানেই প্রাণ হাতে করে যেতে হয়।

রামধন বললে—ফণি ভয়ডর কিছু নেই। আমার তাগায় বাবার মাদুলি।

—আমার কাছে ফুলে-নবলার কবচ।

—কোনোভয় নেই। এগিয়ে পড়ো।

—কারা বোধ হয় মড়া পোড়াতে এসেচে।

রামধন বললে—কে রে ফণি ?

ফণি ভয়ে ভয়ে বললে—ওরা কারা ?কি জানি কি করচে ?

রামধন বললে—কেডা গো তোমরা ?

চার-পাঁচটি লোক শ্মশানে কি খুঁজছে যেন।

কে একজন বললেন—নড়াল বাড়ি। পাকিস্তানের লোক।

—ওখানে কি করচে ?

—হাঁটা দাও ফণি। আমাগোর সে পৌঁছাতে দরকার কি ?

ফণি বললে—বাবা, আমি জানি ওরা কি খুঁজচে ! মড়ার কাপড় নিয়ে গিয়ে তাই কেচে পরবে। ওদের বড় কেষ্ট। কি করবে বলো !

—নাঃ নাঃ, মড়ার কাপড় খুঁজবে কেন ?

—হ্যাঁ বাবা, মড়ার কাপড় খুঁজছে আমি জানি। সেদিন খয়রামারির শ্মশান থেকে দু-জন লোক কাপড় নিয়ে গিয়েচে। অনেকে অমন করচে।

আকাশে নক্ষত্র উঠেচে। বড় বটগাছটায় বাদুড় ঝটপট করচে। দূরে শেয়ালের পাল প্রহর ঘোষণা করলে। ঝিঁকুড় ফুলের বদ গন্ধ বেরুচ্ছে বর্ষার জোলো বাতাসে। ফণির গা কেমন করতে লাগল, ওই তেতো, কড়া, বোটকা গন্ধ নাকে এলে, যেন মনে হল তার জ্বর হল। আরো ক্রোশ খানিক পথ হাঁটল ওরা।

এবার রামনগরের বাজার পড়বে সামনে।

রাস্তার ধারে ঝুলনের বাজার বসেচে, পাঁপড়ভাজা, মাটির ছোবা, পুতুল। পিঁপিঁ বাঁশি। মুড়ি-মুড়কি, ফুলুরি, তালের বড়া। হাঁড়ি, কলসি, সরা। তালপাখা, ঘুনসী, ফিতে, চিরুনি। বিড়ি পান দেশলাই।

লোকে লোকারণ্য রামনগরের ঝুলনের মেলা এদেশের বিখ্যাত ব্যাপার। আশেপাশের অনেক গ্রাম থেকে লোক এসে জুটেচে।

রামধন ও ফণি তাড়াতাড়ি আসরের দিকে চলল।

দূর থেকে একটা হট্টগোল শোনা যাচ্চে, আর শুধু দেখা যাচ্চে লোকের মাথা।

বড় বড় হ্যাজাক লণ্ঠনের আলো জ্বলচে আসরে।

রামধন বললে—ও বাবা ফণি, ক্যামন আসর সাজিয়েচে দেখ ! চল শিগগির এগিয়ে চল।

কিন্তু যাত্রার আসরের গেটে ওদের দু-জন শার্ট-পরা ভদ্রালোক আটকে ফেলে বললে—কোথায় যাচ্চ ?

রামধন ভয়ে ভয়ে বললে—আসরে।

—হবে না, ফিরে যাও—

—আজ্ঞে, অনেক দূর থেকে আসচি—বড্ড কষ্ট করে।

—যাও যাও। একি মামার বাড়ির আবদার—ভাগো—

রামধন হাত জোড় করে বললে—বাবু, একটু জায়গা পাব না ?

ওদের মধ্যে একজন রেগে বললে—না না, হবে না। ভদ্দরলোকের আর মেয়েদের আগে—তারপর তোমাদের।

—বাবু—

—গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দাও তো পরেশ ! ওকে বসতে না দিলে চলচে না আর—ভাগো এখান থেকে।

তার চেয়েও দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

রামধনের ছেলে যুবক এবং তার রক্ত গরম। সে প্রতিবাদের উত্তরে কি বোধ হয় বলেছিল গেটের ওপাশে।

হঠাৎ কিল-চড়ের শব্দে মুখ ঘুরিয়ে দেখলে রামধন, ওর ছেলেকে ঘিরে ফেলে কারা মারধর করচে। সে ছুটে গিয়ে, লোকজনের পায়ে পড়ে ভিড় থেকে বার করে নিয়ে এল।

ফণির চোখের কোণ দিয়ে রক্ত পড়চে। মাথার চুল উসকো-খুসকো—বড্ড মার খেয়েছে সে।

রামধন ছেলেকে নিয়ে একটা দোকান থেকে জল চেয়ে নিয়ে ওকে খেতে দিলে, ওর চোখেমুখে দিলে। কিছু সুস্থ হলে ওকে গরম এক পেয়ালা চা ছ-পয়সা দিয়ে খাওয়ালে।

বললে—দুটো চিঁড়ে ভিজিয়ে দি বাবা—

—না, এখন কিছু খাব না। চলো যাত্রা দেখি।

—কি করে যাবি ওখানে ?আর যাব না, ঢের হয়েচে।

—চলো দূর থেকে দেখবানি—

আসর থেকে বহুদূরে লোকের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওরা সতৃষ্ণ নয়নে আসরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

কলকাতার দলের যাত্রা। গান করছিল একটা ছোকরা হাত-পা নেড়ে। সাহেব সেজে কে একজন দাঁড়িয়ে ছিলেন সামনে। কিছু শোনা যাচ্ছিল না।

মাঝে মাঝে সামনে এসে লোকের দল দাঁড়িয়ে যায়, আর কিছুই নজরে পড়ে না। আবার একচমক হয়তো দেখা যায়—রানী চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদচেন।

সারারাত ওদের এভাবেই কাটল। স্রেফ দাঁড়িয়ে।

ভোরবেলা যাত্রা ভাঙলে রামধন ছেলেকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল। সমস্ত রাস্তা বলে বলে এল—কি পস্কার ! যাত্রার মতন যাত্রা ! দেখলি চোখ জুড়িয়ে যায় ! সত্যি, না হয় আর কলকেতার দল বলেচে কি সাধে ?